মাযহাব মানার প্রয়োজনীয়তা

[২২ মে ২০১৫ ইং তারিখে বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ]

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
প্রভাষক (আরবী)
বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল এম.এ মাদ্‌রাসা

বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া
ফুলতলী ভবন, ১৯/এ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মাযহাব মানার প্রয়োজনীয়তা
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়া
ফুলতলী ভবন, ১৯/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল
জুন, ২০১৫ ঈসায়ী
শা'বান, ১৪৩৬ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বাংলা

প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স
১৯/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
কলম প্রিন্টিং প্রেস
৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ১৫/- [পনের টাকা মাত্র]

MAZHAB MANAR PROYOJONIYOTA By Mohammad Najmul Huda Khan, Published by : Bangladesh Anjumane Talamije Islamia, Fultali Bhabon, 19/A Naya Paltan, Dhaka-1000. Date of Publication : June 2015, Cover Design : Parwana Graphics, 19/A Naya Paltan, Dhaka-1000, Printed by : Kalom Printing Press, 81/1, Nayapaltan, Dhaka-1000. Price : 15.00 (Fifteen) Taka only.

মাযহাব মানার প্রয়োজনীয়তা

মাযহাব ও তাকলীদ বর্তমান সময়ের অতি আলোচিত একটি বিষয়। 'আহলে হাদীস' নামধারী একটি বাতিল ফিরকার অপপ্রচার এ আলোচনা-সমালোচনার মূল কারণ। বর্তমানে বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে মহামারির রূপ ধারণ করেছে। মুসলিম উম্মাহ'র স্বর্ণযুগ তথা সাহাবা, তাবিঈনের যুগ ও এর নিকটবর্তী যুগে মুসলমানগণ কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবনে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হতেন এবং তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতেন। কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া না গেলে সে বিষয়ে উক্ত বিশেষ ব্যক্তিদের ইজতিহাদ বা গবেষণামূলক সিদ্ধান্তকে তারা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। এমনকি সাধারণ মানুষ তাদের ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত মানার ক্ষেত্রে কোনো দলীল অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হতেন না। কিন্তু বর্তমানে এ বিষয়ে ফিতনা ছড়ানো হচ্ছে। এ ফিতনা থেকে সাধারণ মুসলমানকে রক্ষা করে তাদের ঈমান ও আমলকে হিফাযত করা সময়ের দাবি। এ দাবি থেকেই বক্ষমান নিবন্ধ উপস্থাপনা। এতে সংক্ষেপে মাযহাব ও তাকলীদ-এর পরিচয়, মাযহাব মানার আবশ্যকতা, মাযহাব চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার মূল রহস্য, নির্দিষ্টভাবে যে কোনো এক মাযহাবের অনুসরণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনার পাশাপাশি আহলে হাদীস নামধারী ভ্রান্ত ফিরকার অপপ্রচার ও তাদের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

মাযহাব ও তাকলীদ

ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি চারটি : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। মুসলিম জীবনে প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান আমরা এ চারটি বিষয় থেকে পেয়েছি। পবিত্র কুরআন শরীয়তের প্রধানতম মূলনীতি। সুন্নাহ হলো দ্বিতীয় মূলনীতি এবং প্রধানতম মূলনীতি (কুরআন)-এর ব্যাখ্যা। আর ইজমা ও কিয়াস হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গৃহীত দুটি মূলনীতি।

পবিত্র কুরআনে সকল বিষয়ের মূলগত বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই। এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা সুন্নাহ থেকে পাই। আবার অনেক বিষয় সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া যায় না। মুজতাহিদ কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত অন্য দলীলের আলোকে গবেষণার ভিত্তিতে সেগুলো উদঘাটন করেন। মুজতাহিদের এ গবেষণা হলো ইজতিহাদ এবং কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্য খোঁজাটা হলো কিয়াস। যদি কোনো ইজতিহাদের উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে শরীয়তের পরিভাষায় তা ইজমা।

কুরআন ও সুন্নাহর কিছু কিছু বিধি-বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যেমন নামায ফরয হওয়া, রোযা ফরয হওয়া, হজ্জ ফরয হওয়া, যিনা নিষিদ্ধ হওয়া, মদ খাওয়া ও চুরি করা নিষিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। এগুলোর উপর আমলের জন্য কোনো প্রকার ইজতিহাদ বা চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে কিছু কিছু বিধি-বিধান এমনও রয়েছে যা অস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত বা আপাত:দৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ। এ ধরণের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। মুজতাহিদগণ এ কাজটিই করে থাকেন। কোনো মুজতাহিদ অস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আপন ইজতিহাদের ভিত্তিতে যে মূলনীতি উদ্ভাবন ও ফতওয়া পেশ করেন তা-ই তাঁর মাযহাব।

এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধি-বিধান বের করার জন্য ইজতিহাদ বা গবেষণা করা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। এটি এমন ফকীহ ও মুজতাহিদের কাজ, যিনি এর যোগ্যতা রাখেন। বর্তমান সময়ের লা-মাযহাবী ও আহলে হাদীস নামধারীরা সকল মাসআলায় কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল আহরণ করে সে অনুযায়ী আমল করার কথা বলেন এবং সর্বক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর দলীল দাবি করেন। কিন্তু সুস্থ বিবেকের অধিকারী কেউ কি বলতে পারবেন যে, সাধারণ মানুষ কুরআন-সুন্নাহ থেকে দলীল আহরণ করতে পারবে? নিঃসন্দেহে এটি সম্ভব নয়।

তাহলে আমলের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের করণীয় কি? সাধারণ মানুষ তথা কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান আহরণের যোগ্যতা যাদের নেই তাদের করণীয় হলো মুজতাহিদের উদ্ভাবিত মূলনীতি ও ফতওয়া অনুসারে আমল করা। এরই নাম তাকলীদ।

আমরা যারা মুকাল্লিদ আমরা নির্দিষ্ট কোনো একজন ইমামের মাযহাব অনুসারে আমল করি। যেমন: আমরা হানাফী, কেউ শাফিঈ, কেউ মালিকী, কেউ হাম্বলী। এ চার মাযহাবই হক-সত্য। চার মাযহাবের অনুসারীই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আওতাভুক্ত। চার মাযহাবের বাইরে যারা তারা বাতিল-পথভ্রষ্ট। আমরা যারা কোনো ইমাম বা মুজতাহিদের অনুসরণ করি আমরা স্বতন্ত্র স্বত্ত্বা হিসেবে তার আনুগত্য করা ফরয মনে করে তার অনুসরণ করি না অথবা তাকে শরীয়ত প্রণেতা মনে করে তার অনুসরণ করি না। বরং তাঁকে অনুসরণ করি মূলত কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের উদ্দেশ্যে। এ অনুসরণের মূলকথা হচ্ছে-একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান আহরণের যোগ্যতা যেহেতু আমার নেই সেহেতু আমি একজন অভিজ্ঞ মুজতাহিদ ফকীহকে অনুসরণ করছি, যিনি মাসআলা উদঘাটনের যোগ্যতা রাখেন। এ অনুসরণ কুরআন-হাদীসসম্মত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এখানে এ কথাও বলে রাখা প্রয়োজন যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজে ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন তবে তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো মাযহাব অনুসরণ করা আবশ্যক নয়। তিনি আপন ইজতিহাদের আলোকে আমল করতে পারবেন। তবে যেহেতু চার মাযহাব ইজমার ভিত্তিতে সাব্যস্থ হয়ে গেছে সেহেতু তিনি স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে নতুন কোনো মাযহাব বা দল প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। এরূপ করতে গেলে তিনি পথভ্রষ্ট বলে গণ্য হবেন। কেননা ইজমা অস্বীকার করা গুমরাহী। আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী ও জাকির নায়েক গংদের বিভ্রান্তি এখানেই। একদিকে তারা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে না, অন্যদিকে ইজমাকে অস্বীকার করে তারা নতুন মাযহাব বা ইজম প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। এদের অনেকে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় ফতওয়া দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

কোনো ব্যক্তির অনুসরণ (তাকলীদ) জায়িয কিনা?

মাযহাববিরোধীরা মাযহাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেন, কোনো ব্যক্তিবিশেষের অনুসরণ করা জায়িয নয়। তাদের এ বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মুসলমানদের জীবন যাপনের সর্বক্ষেত্রে, সাধারণ পথচলায় হোক কিংবা শরঈ বিধানের বিষয়ে হোক, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এমনকি পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা ফাতিহার মধ্যেও এ বিষয়টি এসেছে। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ তাআলার শেখানো পদ্ধতিতে আমরা আল্লাহর কাছে চাই :

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ– صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ–

অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন, তাদের পথে যাদের আপনি নিয়ামত দিয়েছেন; যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট তাদের পথে নয়।

আর নিয়ামতপ্রাপ্ত কারা তাদেরও পরিচয় আল্লাহ কুরআন মজীদে অন্যত্র দিয়েছেন। আল কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার ব্যক্তিগণ।

যদি কোনো ব্যক্তির অনুসরণ নাজায়িয হতো তবে আল্লাহ তাআলা আমাদের নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পথে চলার কথা বলতেন না।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পাশাপাশি 'উলুল আমর'-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং উলুল আমর এর আনুগত্য কর। (সূরা নিসা, আয়াত ৫৯)

উক্ত আয়াতে أُولِي الْأَمْرِ বলতে কারা- এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কিরাম প্রায় সকলেই বলেছেন, এরা হলেন কুরআন সুন্নাহ'র ইলমের অধিকারী ফকীহ ও মুজতাহিদগণ। আর আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের অনুসরণ করা আবশ্যক।

লা-মাযহাবীরা সকল বিষয় কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার ভার সাধারণ মানুষের উপর ছেড়ে দেন। অথচ মহান আল্লাহ সকল বিষয় সাধারণ মানুষের হাতে ছেড়ে দিতে বলেননি।

আল্লাহপাক ইরশাদ করেন:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.

অর্থাৎ যখন তাদের কাছে শান্তি অথবা ভীতি সংক্রান্ত কোন সংবাদ আসে, তখন তারা তা প্রচারে লেগে যায়। অথচ যদি (তারা তা না করে) বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উলুল আমর এর কাছে ছেড়ে দিত, তাহলে ইস্তিম্বাতে পারদর্শী [মাসআলা উদঘাটনে যোগ্য সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী) ব্যক্তিগণ এর রহস্য উদঘাটন করতে পারতেন। (সূরা নিসা, আয়াত ৮৩)

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোনো জটিল বিষয়ে সাধারণ কোনো ব্যক্তির জন্য নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। বরং এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ লোকদের প্রজ্ঞাশীল সিদ্ধান্তের অনুসরণ ও তাকলীদ করা আবশ্যক।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

অর্থাৎ প্রত্যেক দল থেকে এক একটি ছোট দল ধর্মের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য কেন বেরিয়ে পড়ে না, যাতে তারা যখন তাদের কওমের কাছে ফিরে আসবে তখন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করবে, যেন তারা সতর্ক হয়। (সূরা তাওবাহ, আয়াত ১২২)

উক্ত আয়াতে ধর্মের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য কিছু সংখ্যক লোককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কওমের বাকী লোক যারা এ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ লাভ করতে পারেনি তাদেরকে ঐ জ্ঞানীদের আনুগত্য বা তাকলীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন-

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ তোমরা যদি না জান তাহলে আহলে ইলমদের কাছ থেকে জেনে নাও। (সূরা নহল, আয়াত ৪৩, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ০৭)

এখানেও আল্লাহ যারা জানে না তাদেরকে (সাধারণ মানুষকে) কুরআন হাদীস থেকে সরাসরি ফতওয়া বের করার কথা বলেননি। বরং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন কুরআন হাদীসের ইলমে পারদর্শী লোকদের কাছ থেকে জেনে নেয়।
এরকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, অজ্ঞ লোকেরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে মাসআলা উদঘাটনে না লেগে জ্ঞানী লোকদের অনুসরণ করবে। আর তাকলীদের মর্মও এটিই।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসংখ্য হাদীসেও এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যেমন তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন-

إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مَنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. وَاهْتَدُوْا بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَصَدَّقُوْهُ .

অর্থাৎ জানি না আমি আর কতদিন তোমাদের মধ্যে থাকব। সুতরাং তোমরা আমার পরবর্তীদের অনুসরণ করবে। একথা বলে তিনি আবূ বকর ও উমর (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (তিনি আরও বলেছেন) আর তোমরা আম্মারের পথনির্দেশনা মেনে চলবে এবং ইবনে মাসউদ যা বর্ণনা করেন তা সত্য বলে গ্রহণ করবে। (জামি' আত তিরমিযী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৩৩)
উক্ত হাদীসে 'ইকতিদা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ শরীআতের বিষয়সমূহে কেউ কারো অনুসরণ করা। আর এ ধরণের অনুসরণ কেবল জায়িযই নয় বরং ওয়াজিব।
সহীহ মুসলিম-এর মধ্যে আছে, কোনো কোনো সাহাবী নামাযের জামাতে দেরিতে এসে পেছনে দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে প্রথমে এসে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর তাকীদ দিয়ে ইরশাদ করেন-

فَائْتَمُّوْا بِيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা আমার অনুসরণ কর আর তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের অনুসরণ করবে। (সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৩, হাদীস নং ৬৮০)
যদি কোনো ব্যক্তির অনুসরণ নাজায়িয হতো তাহলে রাসূলে পাক (সা.)-এরূপ বলতেন না।

সাহাবায়ে কিরাম মুজতাহিদ সাহাবীদের তাকলীদ করতেন

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যকার অভিজ্ঞ, ফকীহ ও মুজতাহিদ সাহাবীগণের তাকলীদ তথা অনুসরণ করতেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁর সময়ে এর নির্দেশও দিয়েছিলেন। হযরত ইকরামাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাবিয়া নামক স্থানে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এক ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমাদের যে কুরআন (ইলমে কিরাত)

সম্পর্কে জানতে চায়, সে যেন হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর কাছে যায়। ফরাইয সম্পর্কে জানতে চাইলে যেন হযরত যায়দ বিন সাবিত (রা.)-এর কাছে যায়। ফিক্‌হ সম্পর্কে জানতে চাইলে যেন মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর কাছে যায়। আর অর্থ সম্পর্কিত কিছু জানতে চাইলে যেন আমার কাছে আসে। কারণ আল্লাহ আমাকে সম্পদের ওয়ালী ও বন্টনকারী করেছেন। (তাবারানী, আল মুজামুল আওসাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৭)

হযরত উমর (রা.) যখন হযরত আম্মার বিন ইয়াসির ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-কে কুফায় প্রেরণ করেন তখন তাদের সাথে কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি দেন। চিঠির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ:

إِنِّيْ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ بِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَمِيْرًا وَابْنَ مَسْعُوْدٍ مُعَلِّمًا وَوَزِيْرًا وَهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ وَأُحُدٍ فَاقْتَدُوْا بِهِمَا وَاسْمَعُوْا مِنْ قَوْلِهِمَا.

অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)-কে আমির এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-কে শিক্ষক ও ওযীর হিসেবে পাঠালাম। তাঁরা দু'জনই হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশিষ্ট দুই সাহাবী, যারা বদর ও ওহুদে অংশগ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাদের ইকতিদা করবে ও তাদের কথা মেনে চলবে। (তাবারানী, আল মুজামুল কবীর, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৮৬)

মুজতাহিদ সাহাবীগণ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজ ইজতিহাদের আলোকে ফতওয়া দিতেন এবং অন্যরা তা নির্দ্ধিধায় মেনে নিতেন। এর একটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

হযরত সালিম ইবনে আবদিল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন- তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে অন্য এক জনের কাছে মেয়াদী ঋণে পাওনাদার ছিল। এখন সে মেয়াদের পূর্বে পরিশোধের শর্তে কিছু ছাড় দিতে রাজী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তা অপছন্দ করলেন এবং এরূপ করতে নিষেধ করলেন। (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯৭১, হাদীস নং ২৪৭৯)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের যুগে তাকলীদ প্রচলিত ও স্বীকৃত ছিল। এমনকি স্বয়ং দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সাহাবীকে অনুসরণের ঘোষণা পর্যন্ত দিয়েছেন। যদি তাকলীদ বৈধ না হতো তাহলে উমর (রা.) এরূপ ঘোষণা দিতেন না। এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যুগ থেকে তাবিঈ, তাবে তাবিঈনের যুগ ধরে সর্বযুগে তাকলীদ চলে আসছে। সুতরাং তাকলীদ নাজায়িয হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না বরং তা জরুরী, বিশেষ করে গায়র মুজতাহিদ আলিমের জন্য তা অপরিহার্য।

মুক্ত তাকলীদ ও ব্যক্তিতাকলীদ

প্রকাশ থাকে যে, তাকলীদ দুই প্রকার। যথা:

১. তাকলীদে মুতলাক (মুক্ত তাকলীদ) : মুক্ত ভাবে যে কোনো মাসআলায় যে কোনো মুজতাহিদের অনুসরণ করা।

২. তাকলীদে শাখসী (ব্যক্তি তাকলীদ) : সকল মাসআলায় যে কেনো একজন নির্দিষ্ট ইমাম তথা একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করা।

কুরূনে সালাসাহ তথা প্রথম তিন যুগে যে কোনো মাসআলায় যে কোনো মুজতাহিদের তাকলীদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে মুজতাহিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সঙ্গত কারণে একই মাসআলায় বিভিন্ন মুজতাহিদের ভিন্ন ভিন্ন রায় পরিলক্ষিত হয়। তখন যুগের আলিম ও ফকীহগণ মুক্ত তাকলীদের পরিবর্তে ব্যক্তিতাকলীদের অপরিহার্যতার পক্ষে রায় প্রদান করেছেন। কারণ মুকাল্লিদ বা অনুসারীগণ সকলে সব ক্ষেত্রে অবশ্যই সমান ধর্মপরায়ন নন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুবিধাবাদী হয়ে উঠতে পারেন। এর ফলে যে মুজতাহিদের যে মাসআলাটি তার পছন্দনীয় হবে তিনি সে মাসআলা গ্রহণ করবেন। যেমন:

(ক) শরীরের কোন অংশ হতে রক্ত বের হলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উযু ভঙ্গ হবে, পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে এতে উযু ভঙ্গ হবে না।

(খ) অন্য মাসআলায় কেউ তার স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে উযু ভঙ্গ হবে কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উযু ভঙ্গ হবে না।

তখন মুক্ত তাকলীদের অনুমতি থাকলে সুবিধাবাদী ব্যক্তি, যিনি বিনা উযুতে নামায আদায় করতে ইচ্ছুক তিনি, প্রথম মাসআলায় বলতে পারেন আমি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অনুসারী আর দ্বিতীয় মাসআলায় বলতে পারেন আমি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসারী।

এ অবস্থায় একটি বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় ফুকাহায়ে কিরাম পরবর্তী যুগে যে কোনো একজন ইমামের তাকলীদ বাধ্যতামূলক বলে ফতওয়া প্রদান করেন। সুতরাং এখন বিভিন্ন মাসআলায় সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ বৈধ নয়। বরং যে কোনো একজন ইমামের মাযহাব অনুসরণ করতে হবে।

সাহাবা যুগে নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাকলীদ

সাহাবাযুগেও তাকলীদে মুতলাকের পাশাপাশি তাকলীদে শাখসী বা ব্যক্তিতাকলীদের প্রচলন ছিল। হাদীসগ্রন্থসমূহে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন : সহীহ বুখারী শরীফে হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মদীনার কিছু লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে ঐ মহিলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো যিনি

ফরয তাওয়াফ আদায় করার পর, ঋতুবতী হয়েছেন। [এখন বিদায়ী তাওয়াফের জন্য তিনি পবিত্রতার অপেক্ষা করবেন, নাকি এ তাওয়াফ থেকে তিনি দায়িত্বমুক্ত হয়ে বিদায়ী তাওয়াফ না করে যেতে পারবেন?] ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন (বিদায়ী তাওয়াফ না করে) যেতে পারবে। মদীনার লোকেরা বললেন, আমরা এ বিষয়ে যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-এর মতামত ছেড়ে আপনার ফতওয়ার উপর আমল করতে পারবো না। (সহীহ বুখারী, খণ্ড ২, হাদীস নং ১৬৭১)

এ প্রসঙ্গে কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, মদীনাবাসীগণ বলেছেন- "হে ইবনে আব্বাস (রা.)! যে বিষয়ে আপনি যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-এর বিরোধিতা করছেন এতে আমরা আপনার অনুসরণ করবো না। এর জবাবে তিনি বললেন, (মদীনা পৌঁছে) উম্মে সুলাইম থেকে জেনে নিও (যে কথা আমি বলছি তা সঠিক কি না?)। (মুসনাদু আবি দাউদ তায়ালিসী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৯)

অন্যত্র মদীনাবাসী দলটির মন্তব্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে "হে ইবনে আব্বাস (রা.)! আপনার ফতওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.) তো বলেছেন,ঐ মহিলা (বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়া) যেতে পারবে না।"

উক্ত ঘটনায় মদীনাবাসী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর আলোচনা থেকে দুটি কথা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে :

১. মদীনাবাসী হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)–এর মুকাল্লিদ ছিল (অর্থাৎ তারা তাকে সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করতো) এবং তার বিপরীত কারো কথা গ্রাহ্য করতো না। উপরন্তু মা'জামে ইসমাঈলী ও মুসনাদে আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় রয়েছে যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) স্বীয় মতামতের পক্ষে দলীল দিতে গিয়ে তাদের হযরত উম্মে সুলাইম (রা.)-এর হাদীসও শুনিয়েছেন। কিন্তু হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-এর জ্ঞানের উপর তাদের আস্থা এত গভীর ছিল যে, তার মতের পরিপন্থি হবার কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি হাদীসনির্ভর ফতওয়াও তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো।
২. এ অনমনীয় তাকলীদের অপরাধে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাদেরকে মৃদু ভর্ৎসনাও করেননি [তাদের একথাও বলেননি যে, আপনারা তাকলীদ বা অনুসরণ প্রক্রিয়ায় এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে পাপ বা শিরক করে ফেলেছেন]। বরং তিনি তাদেরকে হযরত উম্মে সুলাইম (রা.)-এর নিকট থেকে মাসআলার যথার্থতা যাচাই করত হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)-এর নিকট পুনরায় যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। (মুফতী তকী ওসমানী, তাকলীদ কী শরঈ হায়সিয়ত)

এ থেকে বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ব্যক্তি তাকলীদ প্রচলিত ছিল এবং তারা এটাকে জায়িয মনে করতেন।

সুনানু আবি দাউদ ও জামি' তিরমিযীসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে-"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে ইয়ামনে (গভর্নর করে) পাঠালেন তখন বললেন, (হে মুআয) তোমার নিকট যখন কোন সমস্যা আসবে তুমি কিভাবে এর ফায়সালা করবে? হযরত মুআয জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কিতাব দ্বারা'। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এ বিষয়ের সমাধান কিতাবুল্লায় না থাকে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ দ্বারা ফায়সালা করবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন, যদি কুরআন ও সুন্নাহতে এর সমাধান না থাকে? হযরত মুআয বললেন, তখন আমি ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিব এবং (সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে) কোন ত্রুটি করবো না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হয়ে হযরত মুআয (রা.)-এর বক্ষের উপর স্বীয় হাত রাখলেন, আর বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত (প্রতিনিধি)-কে এমন যোগ্যতা দিয়েছেন যার উপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট। (সুনানু আবি দাউদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩২৭, হাদীস নং ৩৯৫২)

এ হাদীসটি তাকলীদ ও ইজতিহাদ বিষয়ে এক উজ্জ্বল দিক নির্দেশনা। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো-

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদের জন্য ফকীহ সাহাবীদের মধ্যে মাত্র একজন সাহাবী হযরত মুআয (রা.)-কে পাঠালেন এবং তাঁকে ইয়ামানবাসীদের হাকীম (প্রশাসক), কাযী (বিচারপতি), শিক্ষক এবং মুজতাহিদ বানিয়ে প্রেরণ করলেন, যাতে তাঁরা তাঁর [হযরত মুআয (রা.)-এর] অনুসরণ-আনুগত্য করে।
২. তিনি তাঁকে কেবল কুরআন সুন্নাহই নয় বরং কিয়াস ও ইজতিহাদ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়ারও অনুমতি দিয়েছেন।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসীদেরকে শুধু হযরত মুআয (রা.)-এর একক অনুসরণের বা তাকলীদে শাখসীর অনুমতি দেননি বরং এটাকে তাদের জন্যে আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন।

চার মাযহাবের যে কোনো একটি অনুসরণ করা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় ফুকাহায়ে কিরাম পরবর্তী যুগে যে কোনো একজন ইমামের তাকলীদ করা বাধ্যতামূলক বলে ফতওয়া প্রদান করেন। সুতরাং এখন বিভিন্ন মাসআলায় সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ বৈধ নয়। বরং যে কোনো একজন ইমামের

মাযহাব অনুসরণ করতে হবে। এর দলীল ও সাহাবী যুগে এর নমুনা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ঠিক একইভাবে চার মাযহাবের বাইরে কারো মত বা মাযহাব অনুসরণ করা যাবে না। কেননা, চার মাযহাব ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। আর ইজমা অস্বীকার করা গুমরাহী, এটিও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমদিকে বিভিন্ন মুজতাহিদের বিভিন্ন মাযহাব প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন- চার ইমামের চার মাযহাব, সুফিয়ান সাওরী-এর মাযহাব, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা'র মাযহাব, ইমাম আওযায়ী'র মাযহাব, দাউদ জাহিরী'র মাযহাব, ইসহাক ইবনে রাহবিয়্যাহ-এর মাযহাব ইত্যাদি। কিন্তু চার মাযহাব ছাড়া বাকী মাযহাবসমূহ টিকে থাকেনি। উপরন্তু চার মাযহাবের উপর ইজমা হেতু এর বাইরে বর্তমানে অন্য কারো মাযহাব অনুসরণ করা জায়িয নেই। এ বিষয়ে খ্যাতিমান মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাদী (র.) হাফিয যাহাবী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন- এই বিশ্বাস রাখা আমাদের কর্তব্য যে, চার ইমাম, দুই সুফিয়ান [অর্থাৎ সুফিয়ান সাওরী ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.)] ইমাম আওযায়ী, দাউদ জাহিরী, ইসহাক ইবনে রাহবিয়্যাহ সহ সকল ইমাম হিদায়াতের উপর রয়েছেন। যে ব্যক্তি নিজে মুজতাহিদ নয়, তার জন্যে নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব। হারামাইন শরীফাইন-এর ইমাম [ইমাম মালিক]-এর মতে সাহাবা, তাবিঈ ও ঐসব ইমামদের তাকলীদ জায়িয নয় যাদের মাযহাব সংকলিত ও সম্পাদিত হয়নি। সুতরাং বিচার ও ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম চতুষ্টয় ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ বৈধ নয়। কারণ চার মাযহাবই কেবল সম্পূর্ণ সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে বিশ্বময় বিস্তার লাভ করেছে।

ইবনে তায়মিয়া লা-মাযহাবীদের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি ও তাদের মান্যবর ইমাম। তিনি তার ফতওয়ায় লিখেছেন- কুরআন ও সুন্নাহ'র ক্ষেত্রে ইমাম-মুজতাহিদগণের মধ্যে কোনো মত পার্থক্য নেই। সুতরাং ইমাম মালিক (র.), ইমাম লাইস ইবনে সাআদ (র.), ইমাম আওযায়ী (র.) এবং সুফিয়ান সাওরী (র.) এরা সকলেই নিজ নিজ যামানার ইমাম ছিলেন। তাঁদের একজনের অনুসরণের হুকুম ঠিক তেমনি যেমন অন্য জনের। কোনো মুসলমান একথা বলতে পারবে না যে অমুকের অনুসরণ বৈধ, আর অমুকের অনুসরণ অবৈধ। কিন্তু পরবর্তী যে সকল মনীষী তাঁদের কারো তাকলীদ নিষিদ্ধ করেছেন, তাতে দুটি কারণ রয়েছে।

প্রথমত: ঐ সকল ইমামদের ইন্তিকাল হয়ে গেছে। আর বর্তমানে এমন লোকের অস্তিত্ব নেই, যিনি ঐসব ইমামদের মাযহাব সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত। তাছাড়া, পরলোকগত ইমামের অনুসরণের ক্ষেত্রেও মতানৈক্য বিস্তর। তাই তাঁরা এটাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তাদের মতে, বিগত ইমামের অনুসরণ তখনই জায়িয যখন

জীবিত ইমামের মধ্যে কেউ ঐ ইমামের মাযহাব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখবেন। সুতরাং যেহেতু অন্যান্য ইমামের মাযহাবের কোন আলিম বর্তমান নেই তাই তাদের অনুসরণ জায়িয নয়।

দ্বিতীয়ত: তারা বলেন, যেসব ইমামগণের মাযহাব টিকে থাকেনি তাদের মতের বিপক্ষে উম্মাহর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পরলোকগত ইমামগণের কোনো মতামত যদি এমন হয় যা ঐ ইমামগণের মতের অনুরূপ যাদের মাযহাব এখনো টিকে আছে তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের মতামত ইমামগণের মতামতকে আরো জোরদার করবে এবং তা আরো শক্তিশালী হবে। (আল ফাতাওয়া আল কুবরা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩৬)

লা-মাযহাবীরাও ব্যক্তিবিশেষের তাকলীদ করে থাকে

লা-মাযহাবীরা তাকলীদ তথা নির্দিষ্ট কোনো ইমামের অনুসরণকে অস্বীকার করে এমনকি একে শিরক পর্যন্ত আখ্যায়িত করে। কিন্তু বাস্তবে তারাও কোনো না কোনো ব্যক্তির অনুসরণ করে থাকে। যেমন তাদের কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, ইবনে তায়মিয়া অনুরূপ বলেছেন, অথবা নাসিরুদ্দীন আলবানী অনুরূপ বলেছেন। এমতাবস্থায় তাদের আর আমাদের (মাযহাবপন্থীদের) মধ্যে পার্থক্য হলো, আমরা ইসলামের প্রথম যুগের মুজতাহিদ ইমাম আবূ হানীফা (৮০-১৫০ হি.), ইমাম মালিক (৯৫-১৭৯হি.), ইমাম শাফিঈ (১৫০-২৬০ হি.), কিংবা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১হি.)-কে অনুসরণ করি, যারা রাসূলে পাক (সা.)-এর যুগের নিকটবর্তী। আর তারা ৭০০ বছর পরের ইবনে তায়মিয়া (ওফাত : ৭২৮ হিজরী) ও ১৪০০ বছর পরের নাসির উদ্দীন আলবানীকে (ওফাত : ১৪২১হি./১৯৯৯ইং) অনুসরণ করে।

লা-মাযহাবীদের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার

১. লা-মাযহাবীরা কুরআন মজীদের একটি আয়াত দ্বারা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে তাকলীদকে নাজায়িয ও শিরক বলে থাকে। আয়াতটি হলো এই :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার আনুগত্য কর, তখন তারা বলে- আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে মতবাদের উপর পেয়েছি তার আনুগত্য করব, যদিও তাদের পূর্ব পুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা হেদায়তপ্রাপ্তও ছিল না। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৭০)

এ আয়াত উল্লেখ করত তারা বলে তাকলীদ মানে পূর্ব পুরুষদের অনুসরণ। আর আল্লাহ তাআলা পূর্ব পুরুষদের অনুসরণকে নিষিদ্ধ করেছেন। এটি একটি সুস্পষ্ট

বিভ্রান্তি। কেননা এ আয়াত মুমিনদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়নি। বরং আয়াতটি মুশরিকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। আর এটি আমল সংক্রান্ত তাকলীদ বিষয়ক নয়; বরং ঈমান বিষয়ক। এ আয়াতে মুশরিকদের বলা হয়েছে তারা যেন মুশরিক পূর্বপুরুষদের অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে ঈমান নাে।

২. লা-মাযহাবীরা সকল ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দ্বারা দলীল অন্বেষণ করে। অথচ আমলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসও গ্রহণযোগ্য। ইমাম নববী (র.) (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, হাদীস বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামের নিকট সনদের ক্ষেত্রে উদারতা অবলম্বন ও মাওযু ব্যতীত যঈফ হাদীস বর্ণনা করা এবং এর উপর আমল করা জায়িয। হাদীসের দুর্বলতা উল্লেখ না করেও জায়িয। তবে তা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সিফাত ও বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে নয়। (আত-তাকরীব ওয়াত্ তায়সীর)

লা-মাযহাবীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইবনে তায়মিয়াকে অনুসরণ করে, যিনি তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও মান্যবর ব্যক্তিত্ব। উক্ত ইবনে তায়মিয়াও যঈফ হাদীসকে গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর আমল করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। যেমন মৃতের তালকীন সম্পর্কে তিনি বলেছেন- মৃতের দাফনের পর তালকীন সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত তার সনদ দুর্বল। কিন্তু পূর্বসূরী শামের আলিমগণ এর উপর আমল করেছেন। এ কারণে আমাদের অধিকাংশ লোকদের নিকট ও অন্যান্যদের নিকট তা মুস্তাহাব। (ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, পৃষ্ঠা ২৭৯)

ইবনে তায়মিয়ার উক্ত মন্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, তার দৃষ্টিতে হাদীসের সনদে দুর্বলতা থাকলেও অর্থাৎ হাদীস যঈফ হওয়া সত্ত্বেও এর উপর আমল করা জায়িয ও মুস্তাহাব।

৩. লা-মাযহাবীরা সহীহ হাদীসের ক্ষেত্রে শুধু বুখারী শরীফের কথা বলে। অথচ স্বয়ং ইমাম বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী বুখারী শরীফের বাইরে আরো প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার সহীহ হাদীস তাঁর (ইমাম বুখারীর) মুখস্থ রয়েছে। সুতরাং বুখারী শরীফের বাইরের হাদীসকে গ্রহণ করা যাবে না বা বুখারী শরীফের বাইরে সহীহ হাদীস নেই এমন চিন্তাধারা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

৪. লা-মাযহাবীরা বুখারী শরীফের হাদীসের কথা বললেও তারা নিজ স্বার্থের পরিপন্থি হলে ইমাম বুখারী কিংবা বুখারী শরীফকেও মানে না। যেমন তারা মাযহাব অস্বীকার করতে গিয়ে ইজমাকে অস্বীকার করে। অথচ ইমাম বুখারী ইজমাকে শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এমন আরো অনেক বিষয় আছে যাতে লা-মাযহাবীরা ইমাম বুখারীর বিপরীত মত পোষণ করে। হযরত মাওলানা মুফতী মোঃ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী রচিত ‘তাকলীদ-এর সুদৃঢ় রজ্জু’ নামক গ্রন্থে এর বেশ কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হয়েছে।

৫. লা-মাযহাবীরা একটি অপপ্রচার চালায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) খুব কম হাদীস জানতেন। তাদের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ ইমাম আবূ হানীফা বহু সংখ্যক হাদীস জানতেন। তিনি হাফিযে হাদীস ছিলেন [একলক্ষ হাদীস সনদ ও মতনসহ যে মুহাদ্দিসের মুখস্থ তাকে হাফিযে হাদীস বলা হয়]। তাযকিরাতুল হুফফায, তাবাকাতুল হুফফায, তারাজিমুল হুফফাযসহ হাফিযে হাদীসগণের জীবনী বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর আলোচনা রয়েছে। তিনি চার হাজার তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেছেন। হাফিয মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ সালিহানী আশ শাফিঈ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের বড় বড় হাফিয ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে গণ্য। হাদীসের প্রতি যদি তিনি খুব বেশি মনোযোগী ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন না হতেন, তা হলে ফিকহী মাসয়ালা বের করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না। (তাবাকাতুল হুফফায, আল হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন)

উল্লেখ্য যে, শাফিঈ মাযহাবের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনু আবি শায়বা (র.) তাঁর গবেষণায় বের করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ১২৫টি মাসআলা হাদীসের খেলাফ। হানাফী আলিমগণ তার এ বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন ইমাম আবূ হানীফার এ মাসআলাসমূহও হাদীসভিত্তিক। এখন আমাদের জানা প্রয়োজন ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত মাসআলা কতটি? ইমাম মালিক (র.)-এর সমসাময়িক ইমাম আবুল ফজল কিরমানী (র.)-এর বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত মাসআলার সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। ইবনু আবি শায়বার মতে ১২৫টি মাসআলা হাদীসের খেলাফ ধরে নিলেও তাঁর প্রায় চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত পঁচাত্তরটি মাসআলা হাদীস ভিত্তিক। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা কমপক্ষে প্রায় চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশত পঁচাত্তরটি হাদীস জানতেন।

৬. ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ কোনো কোনো ইমামের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি- إذا صح الحديث فهو مذهبي অর্থাৎ 'সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।' আহলে হাদীস, লামাযহাবী, সালাফীগণ উক্ত 'সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব' কথাটি দ্বারা বুঝাতে চান মাযহাবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে সহীহ হাদীসের উপর আমল করে মাযহাব ত্যাগ করাই একান্ত কর্তব্য। এটিও তাদের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ এ বক্তব্যের মূল অর্থ হলো, ইমাম আবূ হানীফা কিংবা অন্য ইমাম বলেছেন যে, যে হাদীস সকল শর্তসহ সহীহ এবং যার নির্দেশনা সুস্পষ্ট সে হাদীসের ভিত্তিতে আমি আমার মাযহাব গ্রহণ করেছি। সারকথা হলো, ইমামগণের গৃহীত মাযহাব সহীহ হাদীসের ভিত্তিতেই হয়েছে। সুতরাং এর

বিপরীতে অপর কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া গেলেই মাযহাব ত্যাগ করে এর উপর আমল করা যাবে না। কারণ, মাযহাবের সংশ্লিষ্ট ইমাম নিঃসন্দেহে তার নিকট থাকা দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে এক হাদীসের উপর অন্য হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে ফতওয়া দিয়েছেন।

শেষ কথাঃ

মাযহাব ও তাকলীদ কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়। সাধারণ মানুষের জন্য মাযহাব মানা আবশ্যক। এর বিরূদ্ধে যে অপপ্রচার লা-মাযহাবীরা চালিয়ে যাচ্ছে তা থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে বাতিল ও গুমরাহ ফিরকা থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র :

১. আল কুরআনুল কারীম
২. ইমাম বুখারী (র.), আল জামি' আস সহীহ
৩. ইমাম মুসলিম (র.), আল জামি' আস সহীহ
৪. ইমাম আবূ দাউদ (র.), আস সুনান
৫. ইমাম তিরমিযী (র.), আল জামি'
৬. ইমাম মালিক (র.), মুওয়াত্তা
৭. ইমাম তাবারানী (র.), আল মুজামুল কবীর
৮. ইমাম তাবারানী (র.), আল মুজামুল আওসাত
৯. ইমাম আবূ দাউদ তায়ালিসী (র.), আল মুসনাদ
১০. ইবনে তায়মিয়া, আল ফাতাওয়া আল কুবরা
১১. ইবনে তায়মিয়া, ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম
১২. মুফতী তকী ওসমানী, তাকলীদ কী শরঈ হায়সিয়ত